প্রথম আলো

মতামত

অভিমত-বিশ্লেষণ

শিক্ষার্থী ভর্তির সংকট সমাধানে কয়েকটি প্রস্তাব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে দুই পর্বে লিখেছেন **সৌমিত জয়দ্বীপ**। আজ প্রকাশিত হলো **শেষ পর্ব**

সৌমিত জয়দ্বীপ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক

প্রকাশ: ২০ জুন ২০২৬, ১২: ১২

সৌমিত জয়দ্বীপ

ভর্তিযুদ্ধ সিটি করপোরেশন তথা যেসব শহরাঞ্চলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি, সেগুলোতে গোল বাধিয়েছে একদম প্রথম বা তৃতীয় শ্রেণি থেকেই। এই উদাহরণ ভর্তি পরীক্ষা বা লটারি উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এসব প্রতিষ্ঠানে

শিক্ষার্থী যদি একবার সুযোগ পায়, তাহলে দশম, ক্ষেত্রবিশেষে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া যায়। যেসব প্রতিষ্ঠানে এমন একাধিক স্তর আছে, সেগুলোতে ভর্তি-চাপও বেশি। বস্তুত এটাই স্তরান্তরের বড় সমস্যা।

কেন আছে এই স্তরান্তরের সুযোগ? কারণ, চাহিদা-জোগানের সমন্বয় করতে না পারা রাষ্ট্র এদের জন্য ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নইলে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় শতভাগ বেসরকারি হয় কী করে! একা কোচিং সেন্টারই শুধু ব্যবসা করছে না, বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ব্যবসায় হাত পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ফলাফল যা-ই হোক, কোচিং-সংক্রান্ত সমস্যা বা সুবিধা আসলে শহরের মানুষের, বিশেষত শহুরে সচ্ছল ও অভিজাতদের।

সিটি করপোরেশন ও নগরের সংকট জটিলতর

আমরা দেখেছি, যত শহরাঞ্চলের পরিধি সংকুচিত হয়, তত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাড়ে এবং পরিসংখ্যান সাফাই দেবে, এগুলোর প্রায় শতভাগ প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত স্তরান্তরমূলক প্রতিষ্ঠান। এমনকি কোনো কোনোটিতে প্রাক্-প্রাথমিকও আছে!

এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ‘জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠে’র শহর ঢাকার উদাহরণ দিলেই চলে। রাজধানী ঢাকায় মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানের (৬২১টি) মধ্যে সাড়ে ৯২ শতাংশই বেসরকারি। ঢাকা জেলার (৮৬৩টি) ক্ষেত্রে এই হার ৮৬ শতাংশ। আবার, মাধ্যমিক স্তরে সারা দেশে শহুরে শিক্ষার্থীর হার ৩২ শতাংশ হলেও, ঢাকা বিভাগে এই হার ৪৮ শতাংশ।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে ১৪টি বড় শহরের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত হার সাড়ে ৫২ শতাংশ হলেও, ঢাকা জেলায় (৫,২৫০টি) ৮২ শতাংশ। বাকি বিভাগীয় সদরগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেশি এবং চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলায় সরকারি-বেসরকারির অনুপাত কমবেশি ৪৮-৫২ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু ঢাকার নিকটস্থ নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে এই হার যথাক্রমে ৬৭ ও ৭৪ শতাংশ। বলা বাহুল্য, ঢাকা ও আশপাশের বড় শহরগুলো জাতীয় পর্যায়ের (৫৫ শতাংশ সরকারি) হিসাবে ব্যাপক পিছিয়ে আছে। অথচ এই শহরগুলোর জনঘনত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, শিক্ষার্থী চাপও অনেক।

পক্ষান্তরে উন্নীত (আপগ্রেডেড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা (১৭৭টি) ও চট্টগ্রাম (১৫১টি) বিভাগেই অর্ধেকের বেশি (৩২৮টি) বিদ্যালয় অবস্থিত। ঢাকা জেলায় ৬৪টির মধ্যে খোদ সিটি করপোরেশনেই ৫৫টি। মানে, ঢাকার প্রবণতাই হলো স্তরান্তরমূলক প্রতিষ্ঠাননির্ভরতা, যেখানে একবার ভর্তি হলে নিশ্চিন্তে লম্বা সময় পড়া যায়।

► শিক্ষাব্যবস্থার পুরো খোলনলচে বদলাতে হলে সবার আগে প্রয়োজন অভিভাবকদের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন। নইলে কোনো সমাধান ও সুপারিশেই কাজ হবে না। ► প্রাথমিক

থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন অথবা টাস্কফোর্স গঠন অত্যন্ত জরুরি।

আনন্দের খবর, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত উত্তরোত্তর কমছে। ২০১১ সালে যেখানে একজন শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী ছিল ৫৩ জন, সেটি ২০২৪ সালে এসে হয়েছে ২৮ জন। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ২৯ জন। দেশের বিপরীত চিত্র ঢাকায়। প্রাথমিক স্তরে ঢাকা মহানগরের মিরপুর (৭২), লালবাগ (৫২), ক্যান্টনমেন্ট (৫১), রমনা (৫৪), মতিঝিল (৪৮), ধানমন্ডি (৪০), মোহাম্মদপুর (৩৯) ইত্যাদি অঞ্চল অনেক পিছিয়ে। ঢাকায় জাতীয় মানের কাছাকাছি আছে কেবল নওয়াবগঞ্জ (২৫), গুলশান (৩০), সূত্রাপুর (৩১) ও তেজগাঁও (৩১)।

চাপ আছে বলেই দেশের ৭৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বৈত-পালায় চলে। নগরগুলোতে এই হার আরও বেশি। কিন্তু তাতেও আসন-সংকট কাটছে না! সিটি করপোরেশনসহ বড় শহরগুলোর সংকট প্রাথমিক স্তর থেকেই জটিলতর। অথচ সেগুলোতেই সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষত সরকারি প্রাথমিকের প্রতি অভিভাবকীয় অবহেলা প্রাদুর্ভাবে রূপ নিয়েছে।

শিক্ষা ও অভিভাবকদের মনস্তত্ত্ব

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৯ সালের ৬৫,৬২০টির বিপরীতে বিস্ময়করভাবে চার বছরান্তে কমে ৬৫,৫৬৭টি হলেও, ২০২৪ সালে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত ছিল। আবার, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমেছে, কারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের হার উত্তরোত্তর বেড়েছে—২০২০ সালে ১৮,২৭১ জন, ২০২২ সালে ৩৭,৮৪০ জন এবং ২০২৪ সালে ১৪,৪৮৪ জন। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমার বিপরীতে বিস্ময়কর রকম বড় খবর হলো, ২০২৩ সালের চেয়ে ২০২৪ সালে ৩,৬৭,৮৫৩ জন শিক্ষার্থী কমেছে।

শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ‘অভিভাবকেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে স্বশাসিত ধর্মীয় মাদ্রাসায় পড়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন; কারণ, এগুলোতে জন্মসনদ লাগে না এবং ভর্তি হওয়ার জন্য বয়সেরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।’ এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে একটি প্রশ্নই রাখা যায়, মাদ্রাসা থেকে যারা মূলধারায়, এমনকি উচ্চশিক্ষাতেও পড়বে ভবিষ্যতে, তাদের পূর্ববর্তী শিক্ষাগত রেকর্ড ও প্রকৃত বয়স যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তি কী হবে?

সন্তানের বয়স লুকানোর সচেতন প্রয়াস শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটে। বাংলাদেশে বয়স লুকোচুরির জন্য মূলত দায়ী অভিভাবকদের মনস্তত্ত্ব। অভিভাবকেরা সন্তানকে জীবনের শুরুতেই এমন একটি মিথ্যাচারের অংশ করে তুলছেন, যা আসলে আইনের শাসন, নীতিনৈতিকতা, সততা এবং বহুলচর্চিত ধর্মীয়

মূল্যবোধের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা থাকার পরও, খোদ অভিভাবকেরাই যেখানে দুর্নীতির অংশীদার, সেখানে সন্তানকে আমরা কোন শক্তির বলে নৈতিকতার শিক্ষা দেব! রাষ্ট্রব্যাপী অসমবয়সী শিশুদের সম-লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' তৈরি সত্যিই অসম্ভব।

অন্তঃজ শ্রেণির মাদ্রাসামুখী মনস্তত্ত্বটা খুবই সরল। কিন্তু এর বিপরীতে যে সচ্ছল ও অভিজাত শ্রেণি, বিশেষত শহুরে যারা, তাদের মনস্তত্ত্ব যেন এক জটিল বিন্যাসে আবদ্ধ। ধরুন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত দেখার পরও সচ্ছল অভিভাবকেরা যদি বলেন, ঢাকার সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার পরিবেশ 'অনেক ভালো' কিংবা দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মানহীন, তাহলে সেটার গ্রহণযোগ্য যুক্তি কী হতে পারে?

যুক্তি একটাই, অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে সন্তানকে নামকাওয়াস্তে ভর্তি করিয়ে সব মনোযোগ ন্যস্ত করেন কোচিং-নির্ভর প্রাইভেট পাঠকর্মে। কোচিং নামক মারণাস্ত্রটি এভাবেই 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করেছে মূলত অভিভাবকদের ফলনির্ভর শিক্ষা-মনস্তত্ত্বে। ভর্তির আগেও তো সেই একই মনস্তত্ত্বই! লটারিতে কোচিং লাগে না; কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা থাকলে যখন অভিভাবকের সব আকাঙ্ক্ষার পাহাড় চেপে বসে সন্তানের কাঁধে, তখন কোচিং হয়ে ওঠে সাফল্যের ঠিকাদার!

আচ্ছা, বিগত কয়েক বছরে দেশসেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কোথাকার, খবর নিয়েছেন? এগুলো উপজেলা বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের। যে শহুরে বিদ্যালয়গুলোর ভর্তিপ্রক্রিয়া নিয়ে এত মাজাঘষা, সেই শহরস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দেশসেরা হতে পারে না কেন, তা কি গভীরভাবে ভেবেছেন?

গ্রামীণ অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে ওই সব এলাকার সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরা এগুলোতে পড়ে বলে। অভিভাবকদের মানসিকতা এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। সামাজিকভাবে সচেতন ও ক্রিয়াশীল অভিভাবকদের সন্তান থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার পরিবেশ ভালো হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এর সুফল সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও ভোগ করে।

শহরাঞ্চলে জেলা থেকে উপরিকাঠামোর সব ধরনের শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তলানিতে পড়ে থাকে যথাযথ মনোযোগ ও নীতির অভাবে এবং প্রান্তিক এলাকার মতো চমৎকার সমন্বয়ব্যবস্থা না থাকায়। শহুরে ও গ্রামীণ অভিভাবকদের মানসিকতার পার্থক্যই এখানে বড় অনুঘটক।

শহুরে অভিভাবকদের কাছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভালো শুধু বৃত্তি পরীক্ষার জন্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পাওয়ার হার বেশি বলে সন্তানকে বেসরকারির পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয়েও ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি বিদ্যালয় যদি এতই লোভনীয় হয়, তাহলে শুরু থেকেই সন্তানকে কেন পড়ান না অভিভাবকেরা?

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক যাঁরা, সেই অভিভাবকদেরও বলা উচিত, সন্তানদের তাঁরা সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ান না কেন? যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার আইনকানুন তাঁরা বানান, সেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্তানকে পাঠাতে তাঁদের এত অনীহা কেন?

শিক্ষাব্যবস্থার পুরো খোলনলচে বদলাতে হলে সবার আগে প্রয়োজন অভিভাবকদের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন। নইলে কোনো সমাধান ও সুপারিশেই কাজ হবে না। তবু অন্ধের দেশে চশমা ফেরি করার মতো কয়েকটি সমাধান প্রস্তাব করছি।

সমাধান প্রস্তাব

পিএসসির ফলাফলে ভর্তি: প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এবং কোনো প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। গ্রামীণ অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাফল্যের মডেল সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। সর্বস্তরে লটারি বন্ধের পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তিতে মান যাচাইয়ের গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ে বার্ষিক ও বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে পিএসসি পরীক্ষা আবার চালু করে দেশের সব শিক্ষার্থীকে এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করা যেতে পারে। ভালো ফলধারীদের আর্থিক প্রণোদনা বা উপবৃত্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তিতে সব প্রতিষ্ঠানেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়বে।

স্তরান্তর: যেসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ শ্রেণির জন্য ভর্তি-জানালা উন্মুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে আগের স্তরে নিজ প্রতিষ্ঠানে পড়া শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ কোটা সুবিধা দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে, সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম বা তৃতীয় বা ষষ্ঠ বা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালায় তারতম্য দূরীকরণ, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তরান্তর কার্যক্রম সমন্বয় ও ধারাবাহিকভাবে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম শ্রেণিতেই শিক্ষানিবন্ধন: অবৈধ উপায়ে ভর্তির জন্য বয়স কমানোর প্রবণতা রোধে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক অনলাইন জন্মনিবন্ধনের পাশাপাশি একটি জাতীয় শিক্ষানিবন্ধন সার্ভারে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এসভিআরএসের সঙ্গে যুক্ত করলে তথ্যের যেকোনো তারতম্য সহজেই ধরে ফেলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে এই সার্ভারে প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ক্যাচমেন্ট এরিয়া: দেশের যেকোনো প্রতিষ্ঠানের যেকোনো শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ওয়ার্ড বা ইউনিয়নভিত্তিক ‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’র ধারণা প্রয়োগ করে শহর ও গ্রামের জন্য আলাদা সীমানা নির্ধারণ করা জরুরি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সহজলভ্য করতে ক্যাচেমন্ট এরিয়ার মধ্যে শহরাঞ্চলে অন্তত দুটি এবং গ্রামাঞ্চলে একটি করে

সরকারি বিদ্যালয় থাকতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যেন তার জন্মস্থান বা বসবাসস্থান বা পিতা-মাতার কর্মস্থল-সংলগ্ন নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে পারে, সেই পরিকল্পনা থাকতে হবে। একজন সরকারি চাকরিজীবীর দেশীয় শিক্ষামাধ্যমে পাঠরত সন্তানদের পিতা বা মাতার বদলিসূত্রে যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া প্রযোজ্য, সেখানকার সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে।

দ্বৈত পালা: দেশের সব প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দ্বৈত পালা খুলতে হবে এবং কো-এডুকেশন ব্যবস্থায় উভয় পালায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমবণ্টন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একক পালার নামে সকাল-বিকেল 'অফিস' করানো বন্ধ করে শতভাগ দ্বৈত পালা চালু করতে হবে এবং প্রত্যেক পালার সময়সীমা রাখতে হবে সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা। শিশুদের বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলাধুলা ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ দিতে হবে।

জাতীয়করণ, শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম: বেসরকারীকরণের ঝোঁক কমিয়ে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও শতভাগ জাতীয়করণের ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক-সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষক দক্ষিণ এশীয় মানসম্পন্ন বেতন-ভাতাসহ নিয়োগ দিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শহরাঞ্চলেও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। এর বাইরে এক পৃষ্ঠাও বিদ্যালয় তার নিজের পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) পড়াতে পারবে না।

বাজেট: শিক্ষা খাতে জিডিপির ১ দশমিক ৫ শতাংশ আর মোট বাজেটের ১০-১২ শতাংশ বরাদ্দের অবসান ঘটিয়ে মোট জিডিপির ৫ শতাংশ এবং মোট বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে।

কোচিং: বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে সব কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে। তারপরও কোনো শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান কোচিং ব্যবসায় যুক্ত হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষা কমিশন: প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন অথবা টাস্কফোর্স গঠন অত্যন্ত জরুরি।

● **ড. সৌমিত জয়দ্বীপ** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

**মতামত লেখকের নিজস্ব*

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো